১.১.১ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

শর্করা হচ্ছে মানুষের প্রধান খাদ্য। কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে শর্করা তৈরি হয়। শর্করা বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং অল্প মিষ্টি স্বাদযুক্ত। শর্করা আমাদের শরীরে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং তাপশক্তি উৎপাদন করে।

বেশ কয়েক ধরনের শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট রয়েছে এবং এদের উৎসও ভিন্ন। যেমন:

উদ্ভিজ্জ উৎস

শ্বেতসার বা স্টার্চ: ধান, গম, ভুট্টা এবং অন্যান্য শস্য দানা স্টার্চের প্রধান উৎস। এছাড়া আলু, রাঙা আলু বা কচুতেও শ্বেতসার বা স্টার্চ পাওয়া যায়।

গ্লুকোজ: এটি চিনির তুলনায় মিষ্টি কম। এই শর্করাটি আঙুর, আপেল, গাজর, খেজুর ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

ফ্রুকটোজ: আম, পেঁপে, কলা, কমলালেবু প্রভৃতি মিষ্টি ফলে এবং ফুলের মধুতে ফ্রুকটোজ থাকে। একে ফল শর্করাও (Fruit Sugar) বলা হয়ে থাকে।

সুক্রোজ: আখের রস, চিনি, গুড়, মিছরি এর উৎস।

সেলুলোজ: বেল, আম, কলা, তরমুজ, বাদাম, শুকনো ফল এবং সব ধরনের শাক-সবজিতে সেলুলোজ থাকে।

প্রাণিজ উৎস

ল্যাকটোজ বা দুধ শর্করা: গরু, ছাগল এবং অন্যান্য প্রাণীর দুধে এই শর্করা থাকে।

গ্লাইকোজেন: পশু ও পাখিজাতীয় (যেমন: মুরগি, কবুতর প্রভৃতি) প্রাণীর যকৃৎ এবং মাংসে (পেশি) গ্লাইকোজেন শর্করাটি থাকে।

পুষ্টিগত গুরুত্ব

আমাদের শরীরের পুষ্টিতে শর্করার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। শর্করা শরীরের কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং তাপশক্তি উৎপাদন করে। জীবদেহে বিপাকীয় (Metabolic) কাজের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, সেটি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য জারণের ফলে উৎপন্ন হয়।

গ্লাইকোজেন প্রাণীদেহে খাদ্যঘাটতিতে বা অধিক পরিশ্রমের সময় শক্তি সরবরাহ করে। সেলুলোজ একটি অপাচ্য প্রকৃতির শর্করা, এটি আঁশযুক্ত খাদ্য এবং এটি আমাদের দৈনন্দিন মল ত্যাগে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। এছাড়া খাদ্যে প্রোটিন কিংবা ফ্যাটের অভাব হলে শর্করা থেকে এগুলো সংশ্লেষ

বা তৈরি হয়।

শর্করার অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে আমাদের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় শর্করাজাতীয় খাদ্য খেতে হয়। খাদ্যে শর্করার পরিমাণ আবার চাহিদার তুলনায় বেশি হলে অতিরিক্ত শর্করা শরীরে মেদ হিসেবে জমা হয়। তখন শরীর স্থূলকায় হতে পারে; কখনো কখনো বহুমূত্র রোগও দেখা দিতে পারে।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বা শ্বসন প্রক্রিয়ায় আমরা বাতাস থেকে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, সেটি ফুসফুসে আমাদের রক্তের সাথে মিশে যায়। রক্তের লোহিত কণিকা এই অক্সিজেন আমাদের শরীরের কোষে পৌঁছে দেয়, সেখানে গ্লুকোজের সাথে বিক্রিয়া করে তাপশক্তি তৈরি করে এবং এই তাপশক্তি আমাদের সকল শক্তির উৎস।

খাদ্যের মধ্যে নিহিত শক্তিকে খাদ্য ক্যালরি বা কিলোক্যালরি হিসেবে মাপা হয়। ক্যালরি হচ্ছে শক্তির একক। এক গ্রাম খাদ্য জারণের ফলে যে পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে খাদ্যের ক্যালরি বলে। এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা ১° (ডিগ্রি) সেলসিয়াস বৃদ্ধি করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ তাপশক্তি হচ্ছে এক ক্যালরি। এক হাজার ক্যালরি সমান এক কিলোক্যালরি বা এক খাদ্য ক্যালরি (One Food Calorie)। খাদ্যের ক্যালরিকে কিলোক্যালরি দিয়ে বোঝানো হয়। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, শর্করা এবং প্রোটিনের ক্যালরি প্রায় সমান, ৪ kcal/g। স্নেহজাতীয় খাদ্যে অর্থাৎ ফ্যাটের ক্যালরি সবচেয়ে বেশি— এর পরিমাণ ৯ kcal/g। একটা খাদ্যের খাদ্য ক্যালরি বলতে বোঝায় খাদ্যটি সম্পূর্ণভাবে জারণ হলে কতখানি শক্তি বের হবে। (একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মানুষের দৈনিক ২৫০০ kcal এবং একজন নারীর ২০০০ kcal এর সমপরিমাণ খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

১.১.২ আমিষ বা প্রোটিন

কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন— এ চারটি মৌলের সমন্বয়ে আমিষ তৈরি হয়। শরীরে আমিষ পরিপাক হওয়ার পর সেগুলো অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। অর্থাৎ বলা যায় একটি নির্দিষ্ট আমিষের পরিচয় হয় কিছু অ্যামাইনো এসিড দিয়ে। মানুষের শরীরে এ পর্যন্ত ২০ ধরনের অ্যামাইনো এসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এই অ্যামাইনো এসিড হচ্ছে আমিষ গঠনের একক।

উৎস দিয়ে বিবেচনা করা হলে আমিষ দুই প্রকার: প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ। প্রাণী থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তা প্রাণিজ আমিষ। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, পনির— এগুলো প্রাণিজ আমিষ। উদ্ভিদ থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তা উদ্ভিজ্জ আমিষ। ডাল, শিমের বিচি, মটরশুঁটি, বাদাম হচ্ছে উদ্ভিজ্জ আমিষের উদাহরণ।

২০টি অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে ৮টি অ্যামাইনো এসিডকে (লাইসিন, ট্রিপেটোফ্যান, মিথিওনিন, ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, ফিনাইল অ্যালানিন ও থ্রিওনাইনকে) অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড বলা হয়। এই আটটি অ্যামাইনো এসিড ছাড়া অন্য সবগুলো অ্যামাইনো এসিড আমাদের শরীর সংশ্লেষ করতে পারে। প্রাণিজ প্রোটিনে এই অপরিহার্য আটটি অ্যামাইনো এসিড বেশি থাকে বলে এর পুষ্টিমূল্য বেশি।

উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে ডাল, সয়াবিন, মটরশুঁটি বীজ এবং ভুট্টার মধ্যে পুষ্টিমূল্য বেশি এমন প্রোটিন পাওয়া যায়। অন্যান্য উদ্ভিজ্জ খাদ্যে অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড থাকে না বলে এদের পুষ্টিমূল্য কম।

প্রাণীদেহের গঠনে প্রোটিন অপরিহার্য। দেহকোষের বেশির ভাগই প্রোটিন দিয়ে তৈরি। দেহের হাড়, পেশি, লোম, পাখির পালক, নখ, পশুর শিং— এগুলো সবই প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। তোমরা জেনে অবাক হবে প্রাণীদেহের শুষ্ক ওজনের প্রায় ৫০% হচ্ছে প্রোটিন।

১.১.৩ স্নেহ পদার্থ বা লিপিড

ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারলের সমন্বয়ে স্নেহ পদার্থ গঠিত হয়। আমাদের খাবারে প্রায় ২০ ধরনের ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। কঠিন স্নেহ পদার্থগুলোকে চর্বি বলে। চর্বি হচ্ছে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। সাধারণ তাপমাত্রায় এগুলো কঠিন অবস্থায় থাকে। যেমন: মাছ কিংবা মাংসের চর্বি। যেসব স্নেহ পদার্থ তরল, সেগুলোকে তেল বলে, তেল হচ্ছে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। সাধারণ তাপমাত্রায় এগুলো তরল থাকে। যেমন: সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থ দুই প্রকার। যেমন:

১. প্রাণিজ স্নেহ: চর্বিসহ মাংস, মাখন, ঘি, পনির, ডিমের কুসুম— এগুলো হচ্ছে প্রাণিজ স্নেহ পদার্থের উৎস।

২. উদ্ভিজ্জ স্নেহ: বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিজ্জ তেল স্নেহ পদার্থের উৎস। সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, ভুট্টা, নারকেল, সূর্যমুখী, পাম প্রভৃতির তেলে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায়। কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম এবং চিনা বাদামও স্নেহ পদার্থের ভালো উৎস।

স্নেহ পদার্থের কাজ

১. খাদ্যবস্তুর মধ্যে স্নেহ পদার্থ সবচেয়ে বেশি তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন করে।

২. দেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য স্নেহ পদার্থ অতি আবশ্যক।

৩. স্নেহ পদার্থ দেহ থেকে তাপের অপচয় বন্ধ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য খাদ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

৪. ত্বকের মসৃণতা এবং সজীবতা বজায় রাখে এবং চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।

৫. যেসব ভিটামিন (A, D, E এবং K) স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয়, সেগুলো শোষণে সাহায্য করে।

অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার

স্নেহ পদার্থের অভাবে চর্মরোগ, একজিমা ইত্যাদি দেখা দেয়। ত্বক শুষ্ক এবং খসখসে হয়ে সৌন্দর্য নষ্ট

হয়। দীর্ঘদিন স্নেহ পদার্থের অভাব হলে শরীরের সঞ্চিত প্রোটিন ক্ষয় হয় এবং দেহের ওজন কমে যায়। আবার শরীরে অতিরিক্ত স্নেহ পদার্থ জমা হলে দেহে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে এবং এ কারণে মেদবহুল দেহে সহজে রোগ আক্রমণ করে।

১.১.৪ খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

খাদ্যে পরিমাণমতো শর্করা, আমিষ এবং স্নেহ পদার্থ থাকার পরেও জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্য বিশেষ এক ধরনের খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। ঐ খাদ্য উপাদানকে ভিটামিন বলে।

ভিটামিন প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ রাখার জন্য অপরিহার্য। ভিটামিন হচ্ছে জৈব প্রকৃতির যৌগিক পদার্থ। আমরা যদি প্রতিদিন প্রচুর শাকসবজিসহ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাই তাহলে আমাদের দৈনন্দিন খাবার থেকেই প্রয়োজনীয় ভিটামিন পেয়ে যেতে পারি।

কয়েকটি ভিটামিন স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয়, আবার কয়েকটি ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হয়। যেমন:

স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন: ভিটামিন A, ভিটামিন D, ভিটামিন E ও ভিটামিন K।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন: ভিটামিন B কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন C।

স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন A

প্রাণিজ উৎসের মধ্যে ডিম, গরুর দুধ, মাখন, ছানা, দই, ঘি, যকৃৎ ও বিভিন্ন তেলসমৃদ্ধ মাছে, বিশেষ করে কড মাছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন A পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ উৎসের মধ্যে ক্যারোটিন সমৃদ্ধ শাক-সবজি, যেমন- লালশাক, কচুশাক, পুঁইশাক, পাটশাক, কলমিশাক, ডাঁটাশাক, পুদিনা পাতা, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, ঢেঁড়স, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি এবং বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন: আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন A রয়েছে।

কাজ : ভিটামিন A যেসব কাজ করে সেগুলো হলো:

১. দেহের স্বাভাবিক গঠন এবং বর্ধন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার কাজ নিশ্চিত করে।

২. দেহের বিভিন্ন আবরণী কলা যেমন: ত্বক, চোখের কর্নিয়া ইত্যাদিকে স্বাভাবিক ও সজীব রাখে।

৩. হাড় এবং দাঁতের গঠন এবং দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখে।

৪. দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে।

৫. দেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।